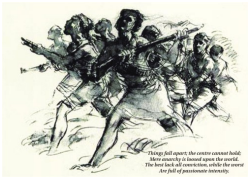

স্বাধীনতার স্মৃতি-২

তোমার আমার ঠিকানা - পদ্মা মেঘনা যমুনা

আতিক রহমান

কিছুকাল হলো মাত্র বাসায় ফিরেছি, গোটা পরিবারসহ আমরা বেশ ক'মাস পালিয়ে ছিলাম গ্রামে আমাদের নানার বাড়ীতে। পরিবারের সবাই এখনও বোন হারানোর বেদনায় ভারাক্রান্ত। আমার বয়স তখন নয় কি দশ হয়তো, বাবার পাশে বসে পড়াশুনা করা, বাবার সাথে নামাজ পড়া, ইত্যাদি ছিল আমার রুটিন কাজ। বাবাকে সেমি রিটায়ার্ড বলা যায়, উনি আসলে জেলা শহরের জর্জকোর্টে প্রাকটিস করতেন। এখন মাঝে সাজে মহকুমা শহরের আদালতে যান, আর বেশীর ভাগ সময়ই কাটান কুরআন শরীফ, অজিফা পাঠ, সংসারধর্ম আর আমাদের ছোটদের পড়াশুনার তদারকি করে। জমিজমার আয় আমাদের ভালই ছিলো, ভালোভাবেই চলে যেতো আমাদের সংসার। মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেকগুলো ভাইবোনের মধ্যে আমার বড়ো হওয়া। অভাবে ছিলাম না সত্য, তবে প্রাচুর্যও যে ছিল অনেক, তাও বলা যাবেনা। যেমন আমার জীবনের প্রথম সুতির জামার বাইরে একমাত্র সুন্দর জামাটি ছিল একটি কেরোলিনের সার্ট। পেয়েছিলাম ঈদের উপহার হিসেবে যখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি। আজো মনে আছে, পিতাভ সবুজ হলুদে জমিনের উপরে কালো রঙ্গের ডোরা কাটা সার্টটি।ওটা পড়ে পাড়ার বন্ধুদের সাথে খেলতে গেলে একধরনের আনন্দসুখ উপভোগ করতাম। একটা হাত ঘড়ির খুব সখ ছিল পুরো হাই স্কুল জীবন ধরে, পেয়েছিলাম কলেজে উঠার পড়, তাও আবার ম্যাট্রিকে ভাল রেজাল্ট করার সুবাদে। আমাদের ছেলেবেলা এই প্রজন্মের কিশোর কিশোরীদের ছেলেবেলার মতো ছিল না।

মহকুমা শহরের সদর রাস্তার উপর আমাদের বাসা। উনসত্তর এবং সত্তরের রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গ দেখেছি বাসায় বসে। মিছিলের পর মিছিল, আর গগন বিদারী শ্লোগান; তোমার আমার ঠিকানা- পদ্মা মেঘনা যমুনা, আইয়ুব ইয়াহিয়া ভাই ভাই–একরশিতে ফাঁসি চাই, বাঁধা দিলে বাঁধবে লড়াই–সে লড়াইয়ে জিত্তে হবে, ছয় দফা/এগার দফার দাবি, মানতে হবে মানতে হবে। মহাজনতার মহামিছিলের স্রোত আর রক্ত গরম করা গগন বিদারী শ্লোগান আমাদের বাসার সামনে দিয়েই যেতো। তবে আজকের দিনের মতো নেতা নেত্রীর চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র এসব শ্লোগান ঔসব মিছিলে ছিলো না। মোট কথা স্বাধীকার আদায়ের আন্দোলনের কোন কিছুই আমাদের নজর এড়াতে পাড়েনি ঐ মহকুমা শহরের। কি যে এক উত্তেজনাকর বিভীষীকাময় দিনগুলো ছিলো সেদিন।এপ্রিলের মাঝামাঝী পাকবাহিনী মহকুমা শহর দখল করলো। ছাত্র জনতা যারা স্হানীয় মাঠে লেফ্ট রাইট আর কাঠের বন্দুক দিয়ে ট্রেনিং নিয়েছিল পাকিদের প্রতিরোধ করবে বলে সবাই গাঁ ঠাকা দিল। এখন পাক আর্মির জীপ আর সেপাই ভর্তি লরি ট্রাক হু হু করে চলে যায় বাসার সামনে দিয়ে, আর ভয়ে আমাদের বুক কাঁপে। দিন গড়িয়ে মাস, মাস গড়িয়ে গ্রীস্ম ও বর্ষা পেরুলো।

---

১০ জানুয়ারী ২০১২

এখন ১৯৭১ এর শরত কাল। ইংরেজীর অগাস্ট সেপ্টেম্বর মাস, তবে শীত পড়তে শুরু করেছে, সাথে সাথে যুদ্ধের ভয়ও যেন আমাদের আস্টে পৃস্টে আঁকড়ে ধরেছে। রাস্তায় মানুষের চলাচল খুবই কম। চারিদিকে অভাবের ছাপ। এমনই এক সকাল, সময় সাত বা সাড়ে সাত হবে হয়ত। আমি বাবার পাশে বসে কি যেন একটা বই পড়ছিলাম, আর রোদ পোহাচ্ছিলাম। আমার বাবা রোজ সকালে বাসার সামনের বারান্দায় চেয়ারে বসে অজিফা পড়তেন, আর আমাদের পড়াশুনার তদারকি করতেন। মাঝে মাঝে পথচারী ফেরীওয়ালাদের কাছ থেকে তরকারী, ডিম এটা ওটা কিনতেন। দুধওয়ালা দুধ দিয়ে যেতো। মাঝে মাঝে তরতাজা মাছ, মুরগীও কেনা হোত এমন ধারায়। বাজারে গিয়ে বাজার করা হতো শুধু মাঝে সাজে।

হঠাৎ পাকিস্তানী আর্মির একটা জীপ কড়া ব্রেক কষে আমাদের বাসার সামনেই থামলো। তার পিছু পিছু একটা পিকআপ ভ্যান একটা মইসহ কিছু কাজের লোক। আমি ও বাবা দু' জনেই হক্ চকিয়ে উঠলাম। বাসার ভিতরের অবস্থা বলার অপেক্ষা রাখে না। মহিলারা দৌঁড়ে পাশের বাসায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। জীপ থেকে এক ইয়াং অফিসার নেমে এলো আর তার পিছু পিছু দুই জোয়ান। বাবাকে সালাম ঠুঁকে উর্দুতে যা বল্লো তার মাথা মুন্ড আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। পাকি নাগরিক হয়ে জন্মেও উর্দুর দৌড় আমার লাড়কা আর লাড়কীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ শব্দ দুটো তাও জেনেছি ভিন্ন কারনে। দীল্লির শহর লখ্নৌ থেকে প্রায় প্রতি শীতকালে পীর সাহেব আসতেন আমাদের এলাকায়। প্রায় তিন পুরুষ ধরে পীর সাহেবরা আসেন আমাদের চত্বরে। ওখানে ওনাদের একখানা কুঠি বাড়ী আছে যেখানে খাদেমসহ অনেক লোকজন এর পরিচর্যা করে। আমার বাবা আমাদের ছোট ছোট ভাইবোনদের নিয়ে যেতেন হুজুরের কাছে দোয়া করানোর জন্য। প্রথম যেদিন বাবা আমাদের নিয়ে গেলেন পীরের কাছে, দেখলাম পীরসাহেব দেখতে দারুন ফর্সা, মাথায় আরবীয়দের মত পাগড়ী, মুখে চাপদাঁড়ি, পান চিবুচ্ছেন, আর ভূর ভূর করে চারপাশে পানের জর্দা আর আতর লোবানের গন্ধ ছড়াচ্ছেন। পীর সাহেব বাবার কাছে জানতে চাইলেন আমরা বাবার কি হই; উত্তরে বাবা জানালেন ইয়ে "লাড়কা", ওই "লাড়কি" হ্যায়। অর্থাৎ আমি লাড়কা, আমার দু'বছরের বড়বোন ছোট্রাপা হন লাড়কি। বাসায় এসে আমরা দু'ভাইবোন কতোইনা হেসেছি এই লাড়কা আর লাড়কি শব্দ দু'টোকে নিয়ে।

বাবা কোলকাতার গ্রাজুয়েট ছিলেন, অনর্গল হিন্দিতে/উর্দুতে কথা বলতে পারতেন। অফিসার বাবাকে যা বলেছিল তার বিবরন এরকম-----রাস্তার ধারে আমাদের দালানের কোল ঘেঁষে বেড়ে উঠা চাড়া আম গাছটা এখনই ছাটাই করে দিতে হবে। চাড়া আম গাছটা সবে কৈশর পেরুয়ে যৌবনে পা দিয়ে তার ডাল পালা মেলে প্রথম যৌবন বিকাশের প্রথম প্রয়াসে এবারই হয়ত মুকুল ছেড়ে আম ধরবে ধরবে ভাব। আর তাই আম গাছটা চিলে কোঠাসহ দালানের এক অংশ বেশ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আর ওটাই ছিল পাকিদের গাত্রদাহের একমাত্র কারন। পাকিদের ভয় ঢুকে গিয়েছিল যে মুক্তিরা হয়ত দালানের ছাদে বসে আম গাছটার ঝোপটাকে আবডাল করে ওদের এমবুস করতে পারে। পাকিরা রাত বিরাত হুস হুস করে এই রাস্তায় গাড়ী দৌড়ায়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জাগয়ায় মুক্তি বাহিনীর হাতে মার

খাওয়া শুরু করেছে। প্রায় রাতেই পুটপাট গুলির আওয়াজ পাওয়া যায়। আর এসব গাছ কাটা, রাস্তার ধারের জঙ্গল ছাপ করা হচ্ছে ওদের ভিতর যে ভয় ঢুকে গেছে তারই জলজ্যান্ত আলামত।

বাবা সাথে সাথে রাজী হয়ে গেলেন, কোন উচ্চ বাচ্যই করলেন না। মুহুর্তের মধ্যে মই ঠেকিয়ে পাকিরা পুরো আম গাছটাকে মুড়িয়ে কেটে দিলো। আমার মা শুধু আক্ষেপ করে বলেছিলেন "খোদার গজব পড়বে তোদের উপর, এমন ফলন্ত গাছটাকে কি করেছে জানোয়ার গুলো"।এর কিছু দিনের মধ্যেই খবর এলো মুক্তিরা মহকুমা শহরের সাথে দক্ষিন অঞ্চলের যোগাযোগের একমাত্র বিশাল ব্রীজটি বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। দক্ষিনের থানাগুলোর সাথে এখন মহকুমা শহরের যোগাযোগ সম্পুর্ন বিচ্ছিন্ন। পাকিরা বেশ কোনঠাঁসা হয়ে পড়েছে বোঝা যায়। অল্প ক'দিনের মধ্যেই আবার খবর এলো আমার নানা বাড়ী যে থানাটিতে অবস্থিত তা মুক্তিবাহিনী দখল করে নিয়েছে। মুক্তীবাহিনী খুব ভোরে থানা আক্রমন করে সব বন্দুক গোলা বারুদসহ থানা দখল করে ফেলেছে। বাঙ্গালী পুলিশ সবাই আত্মসমর্পন করেছে, আর ওখানে এখন নাকি লাল সবুজের পতাকা উড়ছে। আমার মায়ের মুখে সেদিন দেখেছি অপার তৃপ্তির হাসি। আমার মা পাকিদের দু'চোক্ষে দেখতে পারতেন না। এর কারন অনেক।

আমার এক মামাত ভাই পাকিস্তান আর্মির জুনিয়ার অফিসার ছিলেন। সত্তরের ১০ নভেম্বরের মহা প্লাবনে যখন মেঘনা পাড়ের লক্ষ লক্ষ মানুষ বানের জলে ভেসে গিয়েছিলো, খবর পেয়ে তিনি তিন মাসের ছুটি নিয়ে জানুয়ারীর মাঝামাঝি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরে এসেছিলেন। সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন তার ব্যাক্তিগত পিস্তলটি। মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় আসলে আমরা ছোটরা পিস্তলটি ধরে দেখার জন্য বায়না ধরতাম, উনি কক্ষনো আমাদের ধরতে দিতেন না। শুধুমাত্র মাকে পিস্তলটি ধরার সুযোগ দিতেন, তাও অতি সাবধানে আলমারীতে তালা মেরে তুলে রাখার জন্য। ইতিমধ্যে মার্চে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো, উনি আর পশ্চিম পাকিস্তানে কাজে ফিরে গেলেন না। মামাত ভাই বয়সে তরুন, গঠন করলেন দেশের ভিতরে লুকিয়ে থাকা তরুন যুবক, ছাত্র, পুলিশ, আনছার এদের নিয়ে মুক্তি বাহিনী। ঐ পিস্তল তার কাজে লেগে গিয়েছিল শত্রুহননের মহৎ কাজে। তবে এর খেসারত দিতে হয়েছে মামাদের অনেক। মামাদের তিন তিনটি বাড়ী মিলিটারীরা আগুনে পুড়িয়ে ধূলিসাৎ করেছে। আর এই আগুন নিভানোর বিফল চেস্টা চালাতে গিয়ে প্রান হারান অর্বাচিন দু'দুটো মামাত ভাই।

আমার বড় মামার বাজারের বাড়ীতে মিলিটারীরা আগুন দিলো এক দুপুরে। বাড়ীর সবাই আগে ভাগেই পালিয়ে বনে বাঁদড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। মিলিটারীরা আগুন লাগিয়ে চলে গিয়েছে এই ভেবে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো আঠার উনিশ বয়ষের যুবক মামাত ভাই কাজল, আর তার সাথে সাথে পনের ষোল বছরের তার ছোট ভাই সজল। মিলিটারীরা কিন্তু আসলে আগুন লাগিয়ে চলে যায়নি, ওরা ওঁত পেতে বসে ছিলো। ঐ অর্বাচিন টিন এজঠরা তা বুঝতে পারেনি। মিলিটারীরা হাতে নাতে ধরে ফেললো ওনাদের, সাথে সাথে দু'হাত পিঠটান করে বেঁধে ফেললো, নিয়ে যাওয়া হলো ওদের মিলিটারীদের গানবোটে। আর ওখানেই পাকিরা গুলি করে নদীতে ফেলে দিয়েছিল ওনাদের লাশ। কেউ

কোনদিন আর খুঁজেও পায়নি ঐ অর্বাচিন যুবক দুইটির দেহাবশেষ। পুত্র শোকে আমার বড়মামী কাঁদতে কাঁদতে তার চোখের দৃস্টি হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমার আরও দুই দুইটি মামাতো ভাই মুক্তি যুদ্ধে সম্মুখ সমরে প্রান হারান। সর্বমোট আমার চার চারটি মামাতো ভাই স্বাধীনতার যুদ্ধের বলির স্বীকার হোন।

একাত্তরের শরতের আর এক সকাল। রোজকার দিনের মতো আজও বাবার পাশে বসে পড়াশুনা করছি। হঠাৎ বুটের খট্ খট্ আওয়াজ। দেখলাম পড়নে খাকি পোশাক, পায়ে বুট আর মাথায় কেপ পড়ে এক সিপাহী লোক জোড় কদমে বাসার সামনে দিয়ে হেটে যাচ্ছে। হঠাৎ আমাদের বাসার সামনে আসতেই সে হাসতে হাসতে আমাদের বাসার দিকে এগিয়ে এলো। আমি ও বাবা কিছু বুঝে উঠার আগেই সে বাবার সামনে এসে দাঁড়ালো, আর দরাজ গলায় বাবাকে সালাম দিয়ে পরিস্কার বাংলায় বললো– "নানাজান আমি, আমি মতলব"। আমি ও বাবা দু'জনই প্রথমত ভড়কে গিয়েছিলাম। কিছুতেই চিনতে পারছিলাম না লম্বা চওড়া বিশাল এক দেহের অধিকারী খাকি পোশাক পড়া, অথচ বাংলায় কথা বলা এই লোকটাকে। এই ভয়াবহ যুদ্ধের মাঝখানে বাংলায় কথা বলে খাকি পোশাক পড়া লোক, এ আমাদের ভাবনায় মধ্যে ছিলো না। সে মাথার টুপী খুলেতেই সব পরিস্কার হয়ে গেলো। আমি ও বাবা দু'জনই লোকটাকে চিনতে পারলাম। আসলেই তো, সে আমাদের চেনা পরিচিত সেই মতলব মিয়া। লোকটি প্রায়সই আমাদের বাসায় দিন মুজুরের কাজ করতে আসতো। কুড়াল দিয়ে গাছের গন্ডি কেটে জ্বালানী কাঠ করে দেয়া, নারকেল গাছে উঠে নারকেল পেড়ে দেয়া ছিলো তার কাজ। মাঝে মাঝে তার ছোট্র একটি ছেলেকে নিয়ে আসতো আমাদের বাসায় কাজে আসার সময়। ছেলেটি বসে থাকতো, খেলতো আর ওর বাবা কাজ করতো। আমার মা ছেলেটাকে এটা ওটা খেতে দিতেন। এক ধরনের মায়া পড়ে গিয়েছিল ঐ বাপ বেটার প্রতি।

আমার বাবা বললেন, "আরে মতলব তুমি এই খাকি পোশাকে, কোথায় যাচ্ছো"। উত্তরে মতলব বললো, "আমি রাজাকারে নাম লেখাইছি নানাজান, আর্মি ক্যাম্পে যাচ্ছি। কি করুম কন নানাজান, বড় অভাব, তিন চারটা ছেলেপেলে নিয়ে সংসার আর চলে না, ওদের খেতে দিতে পারি না। রাজাকার কমান্ডার আবি মৌলবী কইলো, রাজাকারে নাম লেখাও, বেতন পাইবা সাথে রেশনও পাইবা, তাই রাজাকারে নাম লেখাইলাম। এখন খারাপ নাই নানাজান, রেশন পাই, বাচ্চাগুলারে মুখে অন্তত দু'টা ভাত দিতে পারি। এহন যাই নানাজান, কমান্ডার আমারে খুব ভোরে যাইতে কইছে, দেরী হইলে আবার কি কয়"। এই বলে বাবাকে আরেকবার সালাম ঠুকে হন হন করে চলে গেলো সে।

সেই ছিলো মতলবের সাথে আমাদের শেষ দেখা। দেশ স্বাধীন হলো। অনেক দিন মতলবের দেখা নেই। আমাদের আবার জ্বালানী কাঠের প্রয়োজন হলো। বাবা লোক খুচ্ছেন, লোক মারফত মতলবের খোঁজ নেয়া হলো, খবর এলো মুক্তিবাহিনীর সাথে এক সম্মুখ সমরে মতলব মারা গেছে। ... ... ক্রমশঃ

---

১০ জানুয়ারী ২০১২